পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৬তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির

ক্রোড়পত্র

২ ডিসেম্বর ২০২৩

সভাপতির কিছু কথা

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৬তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে জুম্ম জনগণ তথা সমগ্র দেশবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কিন্তু পার্বত্য চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সেই কাঙ্ক্ষিত সমাধান এখনো অর্জিত হয়নি।

পক্ষান্তরে সরকার পূর্ববর্তী স্বৈরশাসকদের মতো ফ্যাসিবাদী সামরিক কায়দায় দমন-পীড়নের মাধ্যমে পার্বত্য সমস্যার সমাধানের নীতি গ্রহণ করে চলেছে। ফলে পার্বত্য অঞ্চলের পরিস্থিতি উত্তরোত্তর জটিল হয়ে উঠছে। বলাবাহুল্য পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো দেশের এক-দশমাংশ এলাকাকে অগণতান্ত্রিক শাসনের অধীনে রেখে দেশে কখনোই গণতান্ত্রিক শাসন বিকশিত হতে পারে না।

জুম্ম জনগণ তথা পার্বত্যবাসীরা আশা করে যে দেশের প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও বুদ্ধিজীবী সমাজ পার্বত্য সমস্যা সমাধানে অধিকতরভাবে এগিয়ে আসবেন।

তাই পার্বত্য চুক্তির ২৬তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে দেশের স্বার্থে ও জুম্ম জাতির অস্তিত্ব রক্ষার্থে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে অধিকতর সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদানে সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি।

জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা
সভাপতি
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের অবস্থা

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৬ বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। কিন্তু ২৬ বছরেও পার্বত্য চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে পার্বত্য চুক্তির মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধান আজো অর্জিত হয়নি।

বলাবাহুল্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরকারী আওয়ামী লীগ সরকার গত ২০০৯ সাল থেকে ১৫ বছর ধরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রয়েছে। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়েও বর্তমান সরকার পার্বত্য চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে এগিয়ে আসেনি। চুক্তি বাস্তবায়নে সরকার কোনো কার্যকর পদক্ষেপ তো গ্রহণ করেইনি, অধিকন্তু চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি উত্তরোত্তর জটিল থেকে জটিলতর হতে বসেছে।

উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটিকে পাশ কাটিয়ে তথা পার্বত্য চুক্তি লঙ্ঘন করে গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয় কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পর্যালোচনা মূল্যায়ন ও পরবর্তী করণীয় বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি মূল্যায়ন, অগ্রগতি ও পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি’ গঠন করা হয়েছে এবং এই কমিটি একটা প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে।

সরকার (গত এপ্রিলে নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘের সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত আদিবাসী বিষয়ক পার্মানেন্ট ফোরামের ২২তম অধিবেশনে) উক্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে এই মর্মে অসত্য ও একতরফা তথ্য প্রচার করছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৬৫টি ধারা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে। অথচ পার্বত্য চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে মাত্র ২৫টি ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে। ১৮টি ধারা আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে; অবশিষ্ট ২৯টি ধারা সম্পূর্ণভাবে অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়েছে। বিশেষ করে চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো হয় আংশিক বাস্তবায়ন করে অথর্ব অবস্থায় রেখে দেয়া হয়েছে, নয় তো সম্পূর্ণ অবাস্তবায়িত অবস্থায় রাখা হয়েছে। দেশবাসীর জ্ঞাতার্থে চুক্তির অবাস্তবায়িত মূল বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম বিষয়গুলো নিম্নে উল্লেখ করা গেল–

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ:

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ‘ক’ খণ্ডের ১নং ধারায় “পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করিয়া এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ”-এর বিধান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি, পাহাড়ি অধিবাসীদের ভূমি অধিকার সংরক্ষণ, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ যথাযথভাবে কার্যকর করে পার্বত্য অঞ্চলে বিশেষ শাসনকাঠামো স্থাপন, প্রত্যাগত শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ পাহাড়ি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন, পরিষদসমূহে সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ (স্থানীয়), ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি হস্তান্তরকরণ, স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন প্রভৃতি বিষয়াদি বাস্তবায়ন অপরিহার্য ও জরুরি।

ইহাও বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে উভয় পক্ষের মধ্যে আনুষ্ঠানিক সংলাপ চলাকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির দাবির প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক তৎকালীন চিফ হুইপ জনাব আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিদলকে বারংবার জানান যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কথা দিয়েছেন যে উনিশশো আশি দশকে পুনর্বাসিত পাঁচ লক্ষাধিক সেটেলারদের সমতল অঞ্চলে সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন দেয়া হবে। তবে বিশেষ কারণে তা চুক্তিতে উল্লেখ করা যাবে না। কিন্তু আজ অবধি সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসন প্রদান করা হয়নি, যা পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় অধ্যুষিত এলাকার বৈশিষ্ট্যকে ক্ষুণ্ন করে চলেছে।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে ২৩ক উপ-অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি বিকাশ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য নিশ্চিত করা হয়েছে বলে সরকার কর্তৃক যে বক্তব্য পেশ করা হয় তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। অথচ উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণকল্পে (১) সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল বিভিন্ন ভাষা-ভাষী উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল মর্মে সংবিধিবদ্ধ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা, (২) সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদের ৪ উপ-অনুচ্ছেদে “নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের অনগ্রসর অংশের” শব্দসমূহের অব্যবহিত পরে ‘বা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনগ্রসর পাহাড়িদের’ শব্দসমূহ সংযোজন করা, (৩) উনিশশো আশি দশকে পুনর্বাসিত সেটেলারদের সমতল জেলাগুলোতে পুনর্বাসন দেয়ার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা এবং (৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য।

আইন সংশোধন সংক্রান্ত:

চুক্তির ‘ক’ খণ্ডের ২নং ধারায় এই চুক্তির আওতায় যথাশীঘ্র ইহার বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐকমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন আইন মোতাবেক করা হবে বলে বিধান করা হয়। পার্বত্য চুক্তির এই ধারা অনুসারে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ সংশোধন করার মাধ্যমে এই ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে মর্মে সরকার দাবি করে আসছে। অথচ পার্বত্য চুক্তির এ বিধান কার্যকর করার জন্য ১৮৬১ সালের পুলিশ এ্যাক্ট, পুলিশ রেগুলেশন, ১৯২৭ সালের বন আইন ও ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশনসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য অন্যান্য আইন (আইন, বিধিমালা, আদেশ, পরিপত্র, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মবন্টন বা Allocation of Business ইত্যাদি) সংশোধন করা অপরিহার্য। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক বেশ কয়েকটি আইন, বিধি ও পরিপত্র সংশোধন করার জন্য সুপারিশমালা পেশ করা হলেও সরকার কর্তৃক আজ অবধি কোনো পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। এমনকি ভূমি কমিশনের বিধিমালা এখনো প্রণীত হয়নি। সুতরাং এ বিধান সম্পূর্ণ ‘বাস্তবায়িত’ হয়েছে মর্মে সরকারের অভিমত সঠিক নয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন:

পার্বত্য চুক্তির ‘খ’ ও ‘গ’ খণ্ডের বিধানাবলীর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের বিধান করা হয়েছে। কিন্তু চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় এখনো পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ শাসনব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে পারেনি।

(ক) পার্বত্য জেলা পরিষদ

পার্বত্য চুক্তির ‘খ’ খণ্ডে পার্বত্য জেলা পরিষদ সংক্রান্ত ৩৫টি ধারার মধ্যে ৩৩টি ধারা বাস্তবায়িত ও ১টি ধারা আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে এবং অবশিষ্ট ২টি ধারার বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে বলে সরকার দাবি করছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে মাত্র ১৬টি ধারা বাস্তবায়িত, ১৫টি ধারা অবাস্তবায়িত এবং অবশিষ্ট ৪টি ধারা আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে। পার্বত্য জেলা পরিষদ সংক্রান্ত চুক্তির ‘খ’ খণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো নিম্নে উত্থাপন করা গেল, যেগুলো সরকার ‘বাস্তবায়িত’ হয়েছে মর্মে দাবি করছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা বাস্তবায়িত হয়নি–

“অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা” সংজ্ঞা সংক্রান্ত চুক্তির ‘খ’ খণ্ডের ৩নং ধারা তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সত্য, কিন্তু কার্যকর করা হয়নি। উক্ত ধারা লঙ্ঘন করে ২১/১২/২০০০ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক অফিসাদেশের মাধ্যমে সার্কেল চিফের পাশাপাশি ডেপুটি কমিশনারদেরও স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তা প্রত্যাহারের জন্য বারবার দাবি করা সত্ত্বেও প্রত্যাহার করা হয়নি। ডেপুটি কমিশনাররা পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা নন এমন অউপজাতীয় ব্যক্তিদের স্থায়ী বাসিন্দা সনদপত্র দিয়ে চলেছেন।

‘ভোটার হওয়ার যোগ্যতা ও স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন’ সংক্রান্ত চুক্তির ‘খ’ খণ্ডের ৯নং ধারাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে সংযোজিত করা হলেও বাস্তবায়ন করা হয়নি। ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের জন্য পার্বত্য জেলা ভোটার তালিকা বিধিমালা-২০০০ এবং পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নির্বাচন বিধিমালা-২০০০ এর খসড়া প্রণয়ন করে। আইনের ৫৩ ধারা অনুসরণে আঞ্চলিক পরিষদ এ সব বিধিমালার ওপর সুপারিশ পেশ করে। তবে উক্ত বিধিমালাসমূহ আজ অবধি প্রণীত হয়নি। কাজেই এ বিধান ‘বাস্তবায়িত’ হয়েছে মর্মে সরকারের অভিমত সঠিক নয়। “নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ” সংক্রান্ত চুক্তির ‘খ’ খণ্ডের ১০নং ধারাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও এখনো “নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ” করা হয়নি।

‘উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন’ সংক্রান্ত চুক্তির ‘খ’ খণ্ডের ১৯নং ধারায় সন্নিবেশিত “জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করবে”– এই অংশটি আইনে সংযোজিত করা হয়নি। অপরদিকে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের উন্নয়ন কার্যক্রম পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। এছাড়া আঞ্চলিক পরিষদকে পাশ কাটিয়ে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড অধিকাংশ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। ফলে এখনো পার্বত্য জেলা পরিষদের মাধ্যমে পার্বত্যবাসীর নিজেদের উন্নয়ন নিজেরাই নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করার আত্মনিয়ন্ত্রিত উন্নয়ন ধারা গড়ে উঠেনি। তাই এ বিধান ‘আংশিক বাস্তবায়িত’ হয়েছে মর্মে সরকারের অভিমত সঠিক নয়।

‘পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদনিম্ন স্তরের সদস্য নিয়োগ বদলি’ সংক্রান্ত চুক্তির ‘খ’ খণ্ডের ২৪নং ধারাটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে বলে সরকার দাবি করছে। এ বিধানটি আইনে অন্তর্ভুক্ত হলেও আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ক্ষমতা পার্বত্য জেলা পরিষদের মাধ্যমে কার্যকরী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এখনো পর্যন্ত উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য পুলিশ বাহিনী গঠিত হয়নি। অপরদিকে পূর্বের মতো পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পুলিশবাহিনীর বদলি, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষমতা সরাসরি প্রয়োগ করা হয়ে আসছে।

উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির সভায় নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে ‘পুলিশ (স্থানীয়)’ ও ‘আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও উন্নয়ন’ বিষয় হস্তান্তর করা ও পার্বত্য জেলা পুলিশ বাহিনী গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু কমিটির এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করে ১৩ এপ্রিল ২০২২ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার্স থেকে সেনাবাহিনীর প্রত্যাহারকৃত ক্যাম্পের জায়গায় এপিবিএন মোতায়েন করার নির্দেশনা জারি করা হয়, যা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সরাসরি লঙ্ঘন।

পার্বত্য জেলা পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতীত ভূমি বন্দোবস্তি, হস্তান্তর, ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা প্রদান, অধিগ্রহণে বিধিনিষেধ সংক্রান্ত চুক্তির ‘খ’ খণ্ডের ২৬নং ধারাটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে বলে সরকার দাবি করছে। বস্তুত বিধানটি আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও ইহা কার্যকর করা হচ্ছে না। আজ অবধি উক্ত বিষয় ও ক্ষমতা পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হয়নি। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির দোহাই দিয়ে পার্বত্য জেলা পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতীত ডেপুটি কমিশনারগণ নামজারি, ইজারা ও বন্দোবস্তি প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছেন।

চুক্তির ‘খ’ খণ্ডের ৩৪(ক) ধারা মোতাবেক ‘ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা’ বিষয়টি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন অন্যতম একটা বিষয়। কিন্তু আজ অবধি উক্ত বিষয় পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হয়নি। হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি)-দের কার্যাদিও পার্বত্য জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয়নি।

‘ভূমি উন্নয়ন কর আদায়’ সংক্রান্ত চুক্তির ‘খ’ খণ্ডের ২৭নং ধারাটি আইনে সংযোজিত হওয়ার মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে বলে সরকার দাবি করছে। অথচ জেলার ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের হস্তে এখনো ন্যস্ত করা হয়নি। এ ক্ষমতা এখনো ডেপুটি কমিশনারগণ প্রয়োগ করে চলেছেন। তাই এ বিধান ‘বাস্তবায়িত’ হয়েছে বলে সরকারের অভিমত সঠিক নয়।

পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরযোগ্য বিষয় বা কার্যাবলী সংক্রান্ত চুক্তির ‘খ’ খণ্ডের ৩৩ ও ৩৪নং ধারা অনুসারে সংশ্লিষ্ট বিষয় বা কার্যাবলী আইনে সংযোজিত হলেও যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। যেমন জেলার আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ (স্থানীয়), ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, বন ও পরিবেশ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয় এখনো তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হয়নি। এছাড়া পর্যটন, মাধ্যমিক শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলো ত্রুটিপূর্ণভাবে পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হয়েছে। তাই এ বিধানগুলো সম্পূর্ণ ‘বাস্তবায়িত’ হয়েছে মর্মে সরকারের অভিমতও সঠিক নয়।

(খ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সংক্রান্ত চুক্তির ‘গ’ খণ্ডের ১৪টি ধারার সবক’টি বাস্তবায়িত হয়েছে বলে সরকারি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সংক্রান্ত চুক্তির ‘গ’ খণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো নিম্নে উত্থাপন করা গেল, যেগুলো সরকার ‘বাস্তবায়িত’ হয়েছে মর্মে দাবি করছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এসব ধারা বাস্তবায়িত হয়নি।

“পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান-সদস্য নির্বাচিত হবেন” মর্মে চুক্তির ‘গ’ খণ্ডের ২নং ধারায় যে উল্লেখ রয়েছে তা বাস্তবায়িত হয়েছে বলে সরকার দাবি করছে। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর ২৬ বছর অতিক্রান্ত হলেও এখনো তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি এবং নির্বাচিত পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠিত না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়নি। কাজেই এ বিধান বাস্তবায়িত হয়েছে মর্মে সরকারের অভিমত সঠিক নয়।

আরো উল্লেখ্য যে, আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সমন্বয় সাধন করাসহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের ওপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করার বিধানাবলী আঞ্চলিক পরিষদ আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও আঞ্চলিক পরিষদের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করার ক্ষমতা কার্যকর করা হয়নি। এ যাবৎ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অসহযোগিতার কারণে আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসহ যাবতীয় বিষয়াদি তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করা যাচ্ছে না।

তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করার বিধানটি আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও কার্যকর করা হয়নি। তিন পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারগণ অপারেশন উত্তরণের পাশাপাশি পার্বত্য অঞ্চলে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০ অনুযায়ী পূর্বেকার মতো জেলার সাধারণ প্রশাসন সম্পর্কিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করে চলেছেন। তাই চুক্তির ‘গ’ খণ্ডের ৯নং ধারা সম্পূর্ণ ‘বাস্তবায়িত’ হয়েছে মর্মে সরকারের অভিমত সঠিক নয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত আইন প্রণয়নে আঞ্চলিক পরিষদের প্রাধিকার সংক্রান্ত চুক্তির ‘গ’ খণ্ডের ১৩নং ধারা পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইনে সংযোজনের মাধ্যমে ধারাটিকে বাস্তবায়িত বলে মনে করে সরকার। বস্তুত চুক্তির এই ধারা অনুসরণ করা হচ্ছে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আইন প্রণয়নে সরকার আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করছে না বা পরামর্শ নেয়া হলেও তা উপেক্ষা করা হচ্ছে। যেমন– পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০১৪, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন ২০১৪ প্রণয়নের সময় আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ/মতামত উপেক্ষা করা হয়।

পাহাড়ি শরণার্থী পুনর্বাসন:

‘ভারত প্রত্যাগত পাহাড়ি শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত’ চুক্তির ‘ঘ’ খণ্ডের ১নং ধারাটি বাস্তবায়িত হয়েছে মর্মে সরকার দাবি করছে। কিন্তু জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির মতে, ৯,৭৮০ পরিবার তাদের ভিটেমাটি ও জায়গা-জমি ফেরত পায়নি ও অন্যান্য দাবিসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়নি। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন ফেনী উপত্যকার মাটিরাঙ্গা, মানিকছড়ি ও রামগড় উপজেলায়, মাইনী উপত্যকার দীঘিনালা ও চেঙ্গী উপত্যকার মহালছড়ি উপজেলায় এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন মাইনী ও কাচলং উপত্যকার লংগদু উপজেলায় অবস্থিত ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের ৪০টি গ্রাম, ভিটে-মাটি ও জায়গা-জমি এখনো সেটেলার বাঙালিদের পুরো দখলে রয়েছে। তাই এ বিধান ‘সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত’ হয়েছে মর্মে সরকারের অভিমত সঠিক নয়।

অভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু পুনর্বাসন:

‘ঘ’ খণ্ডের ১নং ধারায় বর্ণিত ‘তিন পার্বত্য জেলার অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণ করে টাস্কফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা’ সংক্রান্ত বিষয়টিও ‘বাস্তবায়িত’ হয়েছে মর্মে সরকারের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, যা সঠিক নয়।

২৭ জুন ১৯৯৮ তারিখ খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত টাস্কফোর্সের তৃতীয় সভায় পার্বত্য জেলার অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু বলতে যে সংজ্ঞা নির্ধারিত হয় তদনুসারে ২০০০ সালে অভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু হিসেবে ৯৩ হাজার পাহাড়ি পরিবারকে পরিচিহ্নিত করা হয়েছে। তবে তাদেরকে স্ব স্ব জায়গা-জমি প্রত্যর্পণ পূর্বক পুনর্বাসনের কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি ও ভূমি কমিশন:

চুক্তির ‘ঘ’ খণ্ডে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন সংক্রান্ত তিনটি ধারা (যথাক্রমে ৪, ৫ ও ৬নং ধারা) রয়েছে। এই তিনটি ধারার মধ্যে সরকারের ভাষ্য অনুসারে ৪নং ধারাটি ‘আংশিক বাস্তবায়িত’, ৫নং ও ৬নং ধারা দুটিও ‘বাস্তবায়িত’ হয়েছে, যা সঠিক নয়। বিগত ২৬ বছরেও একটি ভূমি বিরোধও নিষ্পত্তি হয়নি।

গত ৬ অক্টোবর ২০১৬ জাতীয় সংসদে ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৬ পাসের মধ্য দিয়ে ১৫ বছর পর ২০০১ সালে প্রণীত ভূমি কমিশন আইনের বিরোধাত্মক ধারা সংশোধন করা হয়। আইন সংশোধনের পর ভূমি কমিশনের বিধিমালার খসড়া তৈরি করে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের তরফ থেকে ০১ জানুয়ারি ২০১৭ ভূমি মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়েছে। কিন্তু সরকার এখনো সেই বিধিমালা চূড়ান্ত করেনি। এর ফলে ভূমি কমিশনের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির বিচারিক কাজ এখনো শুরু করা যায়নি। এছাড়া ভূমি কমিশনের নেই পর্যাপ্ত তহবিল, জনবল ও পারিসম্পদ।

অস্থানীয় ও অউপজাতীয়দের নিকট প্রদত্ত জমির ইজারা বাতিল সংক্রান্ত:

অস্থানীয় ও অউপজাতীয়দের নিকট প্রদত্ত জমির ইজারা বাতিল সংক্রান্ত চুক্তির ‘ঘ’ খণ্ডের ৮নং ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে মর্মে সরকার দাবি করে আসছে। উল্লেখ্য যে, ২০ জুলাই ও ১৮ আগষ্ট ২০০৯ যথাক্রমে খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় বান্দরবান জেলায় অ-স্থানীয়দের নিকট প্রদত্ত ইজারার মধ্যে যে সমস্ত ভূমিতে এখনো চুক্তি মোতাবেক কোনো রাবার বাগান ও উদ্যান চাষ করা হয়নি সে সমস্ত ইজারা বাতিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে বান্দরবান জেলা প্রশাসক কর্তৃক ৫৯৩টি প্লটের প্রায় ১৫,০০০ একর জমি এবং রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রায় ৩৫০ একর ভূমি লিজ বাতিল করা হয়। তবে বান্দরবান পার্বত্য জেলা প্রশাসন কর্তৃক উক্ত সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে লিজ বাতিলের দু’মাসের মাথায় স্মারক নং-জেপ্রবান/লিজ মো: নং-১০৬০(ডি)/৮০-৮১/২০০৯ তারিখ ১৯/১১/২০০৯ মূলে বাতিলকৃত প্লটগুলোর মধ্যে প্রায় অধিকাংশ প্লট পুনরায় বহাল করা হয়। অন্যদিকে অবশিষ্ট প্লট কাগজে-কলমে বাতিল করা হলেও এখনো সেসব প্লট লিজ গ্রহীতাদের দখলে রয়েছে।

‘অপারেশন উত্তরণ’সহ সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার সংক্রান্ত:

চুক্তি স্বাক্ষরের পর ১৯৯৭-১৯৯৯ সালে পাঁচ শতাধিক ক্যাম্পের মধ্যে দুই দফায় মাত্র ৬৬টি অস্থায়ী ক্যাম্প এবং ২০০৯-২০১৩ সালের মেয়াদকালে ৩৫টি অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার হয়েছে। তবে প্রত্যাহৃত অনেক অস্থায়ী ক্যাম্প পুনর্বহাল করা হয়েছে। তার মধ্যে কেবল কোভিড-১৯ মহামারী কালে কমপক্ষে ২০টি ক্যাম্প পুনঃস্থাপন করা হয়েছে।

চুক্তির এ বিধান অনুযায়ী অস্থায়ী ক্যাম্পসমূহ স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া বিষয়ে কোনো সময়-সীমা আজ অবধি নির্ধারিত হয়নি। ৫৪৫টি অস্থায়ী ক্যাম্পের মধ্যে ১০১টি ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হলেও এখনো প্রায় চার শতাধিক সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর অন্যান্য অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়নি। উল্লেখ্য, পূর্বের ‘অপারেশন দাবানল’-এর পরিবর্তে ১ সেপ্টেম্বর ২০০১ হতে সরকার কর্তৃক একতরফাভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে ‘অপারেশন উত্তরণ’ জারি করা হয়। এই ‘অপারেশন উত্তরণ’-এর বদৌলতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, পর্যটন, উন্নয়নসহ গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনা কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী ভূমিকা পালন করে চলেছে।

অন্যদিকে সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারের পরিবর্তে ১৩ এপ্রিল ২০২২ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার্স থেকে “সেনাবাহিনীর প্রত্যাহারকৃত ২৪০টি ক্যাম্পে পর্যায়ক্রমে পুলিশ মোতায়েন করা হবে” মর্মে এক নির্দেশনা জারি করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল চাকরিতে জুম্মদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ করা:

এ বিধান যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে না। চুক্তির এ বিধান কার্যকর করার জন্য আঞ্চলিক পরিষদ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিকট সুপারিশ পেশ করে। কিন্তু তা কার্যকর করা হয়নি।

এ প্রেক্ষিতে ২২ অক্টোবর ২০০০ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বিষয়টি কার্যকর করার জন্য অনুকূল পরামর্শ প্রদান করে এবং উক্ত পরামর্শ মোতাবেক ২৫-০৮-২০০২ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় চুক্তির এ বিধানটি সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধিমালা/নিয়োগ প্রবিধানমালায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ও সংস্থার নিকট পত্র প্রেরণ করে। কিন্তু চূড়ান্তভাবে এর কোনো অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চু... ২৫ বছর
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে সম্মিলিত বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলুন
সম্মিলিত গণমিছিল
লালদীঘি - চেরাগী পাহাড় মোড়, চট্টগ্রাম, ৩১ জানুয়ারী ২০২৩ মঙ্গলবার।
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন
বাসদ